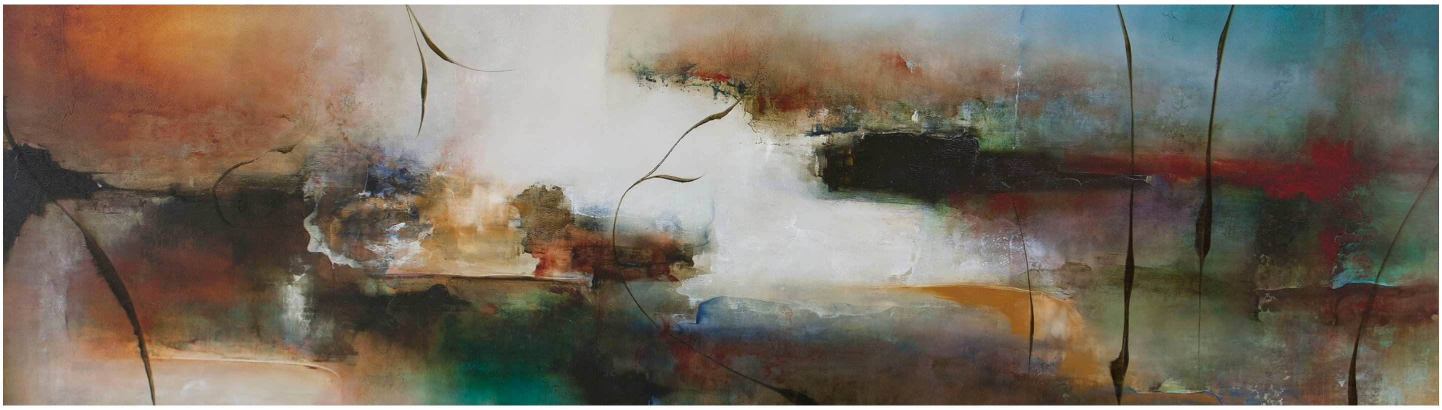

আগামী দিনের ইতিহাস

আলী শরীয়তি

আমার বন্ধুদের অবশ্যই উচিৎ হবে না আজ আমার কাছ থেকে একটা জ্ঞানগর্ভ ও সুসম্পন্ন বক্তৃতা আশা করা। কারণ, বক্তৃতার বিষয়বস্তুর উপর চিন্তা করার জন্যে আমি ঘন্টা দুয়েকের বেশী সময় পাইনি। কিন্তু, ঠিক এ প্রসঙ্গে, কিছুদিন আগে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলাম। আশা করি সেখানে বলা কিছু কথা আজও মনে করতে পারবো এবং আপনাদের সামনে তা-ই উপস্থাপন করবো।

টিবর মেনডে (Tebor mende) হচ্ছেন ইদানিংকালের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিলো "তৃতীয় বিশ্ব"। হাঙ্গেরীয়-ফরাসী এ বিখ্যাত পণ্ডিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ইতিহাস ও সভ্যতার উপর ব্যাপক গবেষণা করেন। তৃতীয় বিশ্ব সম্পর্কিত তাঁর সুচিন্তিত মতামত এবং রচিত গ্রন্থ অত্যন্ত আধুনিক ও প্রগতিশীল বলে বিবেচিত হয়েছে। এ বিখ্যাত পণ্ডিত এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মতো তৃতীত বিশ্বের দেশগুলো পর্যবেক্ষণ করে "A Glance at Tomorrow's History" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

আমি এখানে তাঁর অনাগত ইতিহাস চেতনা বা তাঁর গ্রন্থটি সম্পর্কে কোনো আলোচনা করবো না। বরং আমি তাঁর কাছ থেকে শোনা কথাগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করবো। তাঁর কথাগুলো ছিলো আধুনিক ও বিস্ময়কর।

আন্দ্রে জিদ (Andre Gide) বলেছিলেন, কোন কোন কথা বা বাণী কোন কোন ব্যক্তিকে স্মরণীয় করে রাখার ক্ষমতা রাখে। আর স্মরণীয় করে রাখতে না পারলেও তা অন্ততঃ একটা বোধ বা উপলব্ধির জন্ম দেয়। এমনও হয় যে, আমাদের মধ্যেই কোন কোন বোধ বা উপলব্ধি লুকিয়ে থাকে যার সম্পর্কে আমরা নিজেরাই ভালো বুঝি না। সে সব লুকানো বোধ বা উপলব্ধিগুলো আমরা নিজে নিজে প্রকাশ করতেও পানি না। কিন্তু আমরা যখন এমন একটা বক্তব্য শুনি যা আমাদের মাঝে লুকানো বোধ বা উপলব্ধির সাথে মিলে মিশে একটা ধারণার জন্ম দেয়। এবং এমনিভাবে আমাদের মনোজগতে কোন বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার জন্ম হয়।

"আগামী দিনের ইতিহাস" ভাবনাটা মূলতঃ একটা আধুনিক ও বিপ্লবী অভিব্যক্তি। ইতিহাস তার বিষয় ও মেজাজগত দিক থেকে সর্বদাই অতীতাশ্রয়ী। ইতিহাসের কাজ হচ্ছে অতীতের প্রতিফলন। ইতিহাস বলতেই আমরা বুঝি অতীত। যা কিছু পুরানো তা-ই অতীত। এক্ষেত্রে, "আগামী দিনের ইতিহাস" কথাটা একটা নতুন ভাবনার দ্যোতক। আজকের আধুনিক মানুষ কেবল অতীত ও বর্তমানকে জানতে পারলেই সুখী নয়। মানুষ তার অনাগত ভবিষ্যতকেও নিশ্চিত জানতে চায়। কারণ, আধুনিক মানুষ অনেক বেশী সতর্ক ও সচেতন। তাই আধুনিক মানুষকে আগামী দিন সম্পর্কে ভাবতে হয়। আর আগামী দিনের ইতিহাস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই হতে হবে বিজ্ঞান মনস্ক। এ ক্ষেত্রে ইতিহাসকে বিজ্ঞান হিসাবে বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য।

আমরা যদি সেই অনাগত দিনের ইতিহাস লিখতে পারি তা হলেই ইতিহাস পাবে তার সত্যিকার মর্যাদা। সেই ইতিহাসকে হতে হবে নিশ্চিত ভবিষ্যৎ নির্দেশক। যদি সেই ইতিহাস ভবিষ্যৎ নির্দেশে ব্যর্থ হয়, এমনকি ন্যূনপক্ষে বর্তমান মানবগোষ্ঠি ও অনাগত মানব গোষ্ঠি সম্পর্কে জানতে সহায়ক না হয়, তবে তা হবে অর্থহীন। কারণ, মানবজাতি, ভবিষ্যৎমুখী মানুষের বহমান জীবন এবং বর্তমান ও অনাগত মানবগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ ও আদর্শ নির্দেশে সামগ্রিক সহায়তা প্রদান করাই সমস্ত বিজ্ঞানের নিম্নতম ভূমিকা হওয়া

উচিৎ। এক্ষেত্রে প্রথমেই মানব জাতির অতীত ইতিহাস সম্পর্কে (সম্যক) ধারণা থাকা আবশ্যক যা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ইতিহাস নির্মাণে সহায়ক হবে।

টিবর মেনডের মতো নয় বরং আমি আমার বিশ্বাসের আলোকেই আগামী দিনের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করতে চাই। আমার কথা বলার ভঙ্গি বক্তার মতো না হয়ে শিক্ষকের মতো হওয়াটাই স্বাভাবিক; কারণ পেশায় আমি একজন শিক্ষক। এ জন্যে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সৌভাগ্যশতঃ আমার সামনে বসা মুখগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরই যারা আমার বাচনভঙ্গি ও বক্তব্যের সাথে পরিচিত।

আমার বক্তব্যকে অনুধাবনের জন্যে আমি আপনাদেরকে কল্পনার একটা কোণ (Cone) ধরে নিতে বলবো। (কোণ একটা গাণিতিক কাঠামো যার ভূমি সংলগ্ন অংশটা সবচেয়ে বিস্তৃত ও বৃত্তাকার। কাঠামোটি ভূমি থেকে উপরের দিকে ক্রমশঃই বৃত্তাকারভাবে সরু হবে। কাঠামোর শীর্ষ বিন্দু সূক্ষ্ম বা সুচালো। অনুবাদক) আমার বক্তৃতা শেষ হওয়া পর্যন্ত আশা করি কোণটার কথা মনে রাখবেন। কারণ এর ভিত্তিতেই আমি আমার বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করবো।

এ কোণ হলো আমাদের চিন্তা, বিচার বিশ্লেষণ ও অনুধাবনের কাঠামো। একটা যুগের সমাজ, সভ্যতা ও ইতিহাস তার পরবর্তী যুগের সমাজ, সভ্যতা ও ইতিহাসকে অনুসরণ করে। ব্যাপারটা এমন যে অতীতের মানব সভ্যতার কোনো একটা যুগ ক্রমশঃ পরবর্তী একটা সভ্যতর ঐতিহাসিক যুগে উত্তীর্ণ হয়। কোন একটা যুগ শেষ পর্যায়ে এসে থেমে যায় না বরং পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগের সূচনা করে। এর অর্থই হলো ইতিহাস বহমান। টিবর মেনডের ভাষায় মানব সভ্যতার প্রথম সূর্যোদয় হতে আজ পর্যন্ত ৩, ৪, ৫, ১০ এমনিভাবে ২৭ টি যুগ পার হয়ে গেছে।

একটা অস্তিত্বশীল জীবন্ত সত্তার মতো প্রতিটি যুগেরই আছে ভিন্ন মেজাজ, চিন্তাধারা ও বিশেষ ধরণের ভাবপ্রবণতা। আমরা আজ ভালোভাবেই জানি অবস্থা, স্বকীয়তা, চিন্তাধারা, ঝোঁক-প্রবণতা ও লক্ষ্যের দিক থেকে প্রতিটি যুগেই তার আগের যুগ হতে স্বতন্ত্র।

সুতরাং প্রত্যেকটি যুগকে বোঝার জন্যে আমাদের কল্পিত কোণ খুবই প্রয়োজনীয় এবং এরই আলোকে ইতিহাসের প্রতিটি যুগকেই সূক্ষ্মভাবে বিভক্ত করা যাবে। আর তার উপর সতর্ক অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা এমনকি ভবিষ্যত সম্পর্কেও বলতে পারবো।

উদাহরণ হিসেবে, আমরা তিনশত বৎসর পূর্বের মধ্য যুগের ইউরোপীয় ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করতে পারি। এক্ষেত্রে আমাদের কল্পিত কোণকেই আমরা মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করবো। এর ভূমি সংলগ্ন অংশ যা সবচেয়ে বেশী বিস্তৃত, সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দ্বারা পূর্ণ। এই জনগণ কারা? এরা হলো সমাজের সাধারণ মানুষ। প্রত্যেকটি সমাজেরই সাধরণ মানুষ তাদের সংখ্যা ও স্তরের বিবেচনায় আমাদের কল্পিত কোণ এর ভূমিতেই অবস্থান করে।

প্রতিটি যুগের পণ্ডিত ও চিন্তাবিদদের অবস্থান আমাদের কোণটির উপরের অংশে। এরা হলো বুদ্ধিজীবী। তার মানে হলো, এদের যাবতীয় কার্যাদি মূলতঃ বহুমুখী চিন্তার ক্ষেত্রে আবর্তিত। শরীরের কোন অঙ্গ বা কারখানার কোনো হাতিয়ারের মতো এরা কাজ করেন না। এমনিভাবে ধর্মীয় নেতা, পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও দার্শনিকগণের অবস্থান হলো কোণর উপরের অংশে।

কোণটির সবচেয়ে নীচের অংশে অবস্থান করে প্রতিটি সমাজের সাধারণ মানুষ। বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অবস্থান হলো এর উপরের অংশে। আদিম সমাজের জন্যেও একথা প্রযোজ্য। আদিম সমাজের গোত্রবদ্ধ গণমানুষের কোণর ভূমিতেই অবস্থান করতো তখনকার ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক লোকগুলো বলতে বোঝাতো জাদুকর, শ্বেতশ্মশ্রুধারী অথবা যে কোনভাবে জনগণের নেতৃত্ব দেয় এমন ব্যক্তিবর্গ।

বহুযুগ পার হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের কোণটি সব যুগ বিশ্লেষণে সমানভাবে প্রযোজ্য। আমার বিশ্বাস দিন যত এগুচ্ছে কোণর ভূমি সংলগ্ন সাধারণ মানুষের অবস্থানও ক্রমশঃ বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরের নিকটবর্তী হচ্ছে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং একই হারে তা বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীতে যুক্ত হচ্ছে। মানে হলো, প্রতিটি যুগেই বিদ্বান ব্যক্তিদের সংখ্যা তার পূর্ববর্তী যুগের সংখ্যা হতে বৃহত্তর হচ্ছে। কারণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি এখন ব্যাপক রূপ লাভ করেছে। চিন্তার বিকাশ ঘটেছে। শিল্প ও বিজ্ঞানচর্চা অতি সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষ ক্রমান্বয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরের দিকে উন্নীত হচ্ছে।

সাধারণ জনগণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীর মধ্যে আজ আর তেমন পার্থক্যসূচক সীমারেখা নেই। আমরা আমাদের কল্পিত কাঠামো বা কোণ ধরে যতই উপরে উঠবো, দেখবো যে সাধারণ জনগণ ক্রমশঃই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীর নিকটবর্তী হচ্ছে। এবং আগেই বলছি

উচ্চতর স্তর তো বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীরই অবস্থান। আবার নীচের দিকে নামলে দেখা যাবে যে, বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীটা সাধারণ জনগণের কাছাকাছি এসে পড়েছে। অপরদিকে □কোণ□টি বেয়ে উপরে যেতে এমন একটা অবস্থানে পৌছানো যায় (যা শীর্ষবিন্দু) যেখানে প্রতিটি যুগের বিশেষ কিছু পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব অবস্থান করেন। এসব ব্যক্তিগণ সমাজের শিক্ষিত মানুষের কাছে রীতিমতো মূর্তিতে পরিণত হন। এমনিভাবে প্রতিটি যুগের সেইসব শীর্ষস্থানীয় চিন্তাবিদগণ তাঁদের যুগের চিন্তা-চেতনার উৎস হয়ে দাঁড়ান।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জ্যাঁ পল সাঁত্রে, বার্ট্রান্ড রাসেল, সোয়ার্জ প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ আমাদের □কোণ□ এর শীর্ষ বিন্দুতে অবস্থানরত। তাঁদের অবস্থান হলো বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীর শীর্ষে। এ শ্রেণীর নিম্নতম ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন স্কুল পড়ুয়াগণ। অবস্থানের দিক দিয়ে তাঁরা অবশ্য সাধারণ জনগণের কাছাকাছি। এই হলো আমি যা বলতে চাই তার ভূমিকা - এবার আমি মূল বক্তব্য শুরু করবো।

কল্পিত □কোণ□টা আমরা মধ্যযুগের বেলায় প্রয়োগ করবো। মধ্যযুগের সাধারণ জনগণ কারা? তখনকার ফ্রান্স, ইতালী ও ইংল্যান্ডের জনসাধারণ গীর্জায় যেত। তারা যাজকদের আদেশগুলো পালন করতো। বাইবেল, পেন্টালিক, যীশু বা ঈশ্বরের নামে দেয়া সরকারী পণ্ডিতদের নির্দেশগুলো বাস্তবায়ন করতো। এইসব নির্দেশ শ্রবণ, গ্রহণ ও অনুশীলন করাই ছিলো তাদের কাজ। এরা হলো মধ্যযুগের সাধারণ মানুষ।

এই একই অনুভূতি ও বৈশিষ্টসম্পন্ন সাধারণ জনগণের উপস্থিতি আজও সমাজে রয়েছে। বড়দিন উপলক্ষে সেন্ট পিটারসের বাতায়নের ফাঁক দিয়ে পোপ যখন আবির্ভূত হন তখন তাঁর মহামূল্যবান শ্বেত শুভ্র পবিত্র পোশাক দেখে আজও লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ খৃষ্টান ধর্মীয় অনুভূতি ও আবেগ উদ্বেল হয়ে পড়ে। তারা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন জুড়ে দেয়। এ হলো তেমন অনুভূতি ও চিন্তা, যেমনটা তিন চার শতাব্দী আগে মধ্যযুগীয় ইতালী বা ফ্রান্সের জনগোষ্টি ধর্মীয় আবেগে লালন করতো।

আমরা প্রায়ই বলি এখন নতুন যুগ চলছে। এর অর্থ কি? অর্থ হলো বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীর মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটেছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে নয়। সুতরাং প্রতিটি যুগের এইসব বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীর মধ্যে কি ধরণের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা ছিলো তা আজ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

> এর পরেও কথা থেকে যায়। প্রতিটি যুগে সাধারণ মানুষ এবং উচ্চস্তরে অবস্থানরত শিক্ষিত বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীর বাইরেও হাতে গোনা ব্যক্তিক্রমধর্মী কিছু ব্যক্তিত্ব থাকেন। যাঁদের চিন্তা ও বিশ্বাস তাঁদের সমসাময়িক বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীর চিন্তা ও বিশ্বাসের মধ্যে বৈপরীত্যসূচক চৈতন্যের সূচনা করে। তাঁরা সে যুগের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত হন। সাধারণের মধ্যেও তাঁদেরকে গণ্য করা যায় না। তাঁদেরকে কোনো বিশেষ কালের বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীর মধ্যেও ফেলা যায় না। তাঁরা হচ্ছেন সমগ্র মানব গোষ্ঠির সেই প্রখ্যাত প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব যাঁদেরকে কোন কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। কারণ, তাঁরা যে-কথা বলছেন বা যে-চিন্তা করছেন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বলে পরিচিত গোষ্ঠি সে কথা বলেন না, তা ভাবেন না বা তা বিশ্বাসও করেন না, করার প্রয়োজনও বোধ করেন না। তাঁদের কথাগুলো খুবই নতুন। বোমার মতো তার বিস্ফোরণ।

এঁদের পরিচয় কি? এঁদেরকে তো কোন বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করা যায় না। এঁদের সংখ্যা খুবই নগণ্য, হাতে গোনা ক□জন মাত্র। তবে এটা ঠিক যে, এঁরা প্রতিভাবান। এঁরা আধুনিক চিন্তা ও চেতনার উদ্ভাবক। এঁদের মানস প্রবণতা সমসাময়িক সমাজের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ হতে ভিন্নতর, শিক্ষা-ঐতিহ্যের পরিপন্থি, বিজ্ঞান পদ্ধতির বিপরীত এবং যুগ ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক।

মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো। তখনকার ইউরোপের সাধারণ মানুষ বর্তমান ইউরোপের সাধারণ মানুষের মতোই জীবন যাপন করতো যেমন আজকের আধুনিক ইউরোপের সাধারণ ইউরোপের সাধারণ মানুষ গীর্জার আনুগত্য করে এবং সাবেক মধ্যযুগীয় যাজকদেরই মেনে চলে।

ইউরোপের শিক্ষিত সমাজের আবির্ভাব তিন শতাব্দী আগে, সতের শতকে। এই শতকেই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ ক্রমশঃ বর্তমান অবস্থায় পরিণতি লাভ করে। আজ যাঁরা বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠি হিসেবে পরিচিত- যাঁরা নতুন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, তাঁরা মূলতঃ সতের শতকের বুদ্ধিজীবীদের আধুনিক সংস্করণ মাত্র। আজও তাঁদের ভাবধারাকে লালন করা হয়, তাঁদের মতোই তাঁরা চিন্তা করেন, বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও তত্ত্বের বেলায় তাঁদেরকেই তাঁরা অনুকরণ করেন। এ ভাবে তাঁরা, সতের শতকে ইউরোপে গড়ে ওঠা, শিক্ষিত সমাজ যাঁরা অদ্যাবধি বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান ও আধুনিক জীবন ধারাকে চালিয়ে নিচ্ছে

তাঁদের অনুগামীদের বাড়তি একটা সংযোজনে পরিণত হন।

মধ্যযুগের এসব শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীদের পরিচয় কি? তাঁরা ছিলেন খ্রীষ্টান ধর্মযাজক ও গীর্জার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের লক্ষ্য ছিলো ধর্মীয় সত্যকে আবিস্কার করা। সাধারণ মানুষদের আলো অভিসারে নিয়ে আসা। জনগণের নেতৃত্ব দেয়া। মূলতঃ তাঁদের লক্ষ্য ছিলো একই ধর্মীয় আবর্তে বিপুল জনগোষ্টিকে উদ্বুদ্ধ ও একই দলভূক্ত করে তোলা।

এভাবে দেখা যায় যে, কোণটি যখন আমরা মধ্যযুগে বিশ্লেষণে ব্যবহার করি তখন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বলতে যা বোঝাতো তা মূলতঃ খ্রীষ্টান যাজক ও ধর্মীয় নেতাদের দ্বারাই পরিপূর্ণ ছিলো। তখনকার দিনের ধর্মীয় নেতাদের আপনারা ভালোভাবেই চেনেন। কিন্তু পনের হতে সতের শতকের মাঝামাঝি এই দীর্ঘ সময়ে এসব ধর্মীয় নেতাদের পাশাপাশি আরোও কিছু প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব জন্ম নিয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন নতুন চিন্তার ধারক ও বাহক। কিন্তু তখনও পর্যাপ্ত কোন শ্রেণীতে তাঁরা রূপান্তরিত হতে পারেননি।

এ সময়ের কতিপয় চিন্তাবিদ সাধারণ ধর্মপ্রাণ, ঈশ্বর ভক্ত খ্রীষ্টান মূল্যবোধ পরিহার করে একটা নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন।

তাঁরা ষোল হতে আঠার শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে (কোণ-এর) শীর্ষে আরোহণ করেন। মধ্যযুগীয় শিক্ষিত সমাজের ধর্ম বোধে অনুগত না হয়ে তাঁরা হয়ে উঠলেন বিজ্ঞানমনস্ক। ধর্মের কথা হলো, ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর দ্বারা অনুমোদিত বিষয়গুলোকেই গ্রহণ করতে হবে, আর যা উল্লেখ করা হয়নি তা সবই পরিত্যাজ্য। ঠিক তেমনি ভাবে তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, কেবল বিজ্ঞান ও পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত বিষয়গুলোকেই তাঁরা বিশ্বাস করবেন। ধর্ম বা পবিত্র গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত থাকলেই কোন কিছুর উপর তাঁরা বিশ্বাস আনবেন না, যতক্ষণ না তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত সত্যে পরিণত হয়।

এভাবেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সূচনা হলো। কেপলার ও গ্যালিলিওর মতো বিখ্যাত পণ্ডিতবর্গ বিজ্ঞান ভাবনার প্রচার ও প্রসার ঘটালেন। এভাবেই মধ্যযুগীয় ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ও প্রচার তীব্র আকার ধারণ করলো। তখন এই বিজ্ঞান-মনস্ক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণী সোচ্চার হয়ে উঠলো। তাঁদেরকে নিন্দা করলো, ধর্মের শত্রু বলে আখ্যা দিলো, কারাগারে নিক্ষেপ করলো, বিচারের কাঠগড়ায় আসামী হিসেবে হাজির করলো; এমনকি আগুনে পোড়ালো। গ্যালিলিও যার জ্বলন্ত উদাহরণ। কেন? কারণ, তাঁরা সমাজের সনাতন শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে নতুন ধ্যান-ধারণার প্রচার করেছিলেন।

মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে সাধারণ জনগণ ও শিক্ষিত শ্রেণীর (ধর্ম বিষয়ে শিক্ষিত ও গীর্জার সাথে সম্পর্কযুক্ত) চেয়ে উপরের স্তরের একটা স্বতন্ত্র প্রতিভাবান দলের উন্মেষ ঘটে। যারা ছিলেন সংখ্যায় অতি নগন্য, ১০/১২ জনের মতো। এই ক্ষুদ্র দলভুক্ত প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ ধর্মীয় মূল্যবোধের বিপরীতে নতুন চিন্তা ও চেতনার প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তাঁরা সমাজে একটা শ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি। তাঁরা ছিলেন বিচ্ছিন্ন কতিপয় ব্যক্তি মাত্র।

এবার আমরা আধুনিক যুগে বিশ্লেষণে আমাদের কোণটা ব্যবহার করবো। আধুনিক যুগের সময়কাল সতের থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। আমরা দেখবো যে এ যুগের সাধারণ জনগণের মধ্যে মূলতঃ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। শুধু আয়তনের দিক থেকে এ শ্রেণীর হ্রাস ঘটেছে এবং এ শ্রেণী হতে কিছু ব্যক্তি শিক্ষিত হয়ে উপরের শ্রেণীতে যোগ দিয়েছে।

আধুনিক যুগের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে এবার ভাবা যাক। তাঁদের অবস্থান হবে আমাদের কোণ-এর শীর্ষে। আজ তাঁরা ঠিক একই কথা বলছেন যা ষোল শতকের প্রতিভাধর বিচ্ছিন্ন কতিপয় ব্যক্তিবর্গ বলতেন। যে কথাগুলো তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। এমনভাবে দেখা যায় যে কোণ-এর শীর্ষে সর্বদাই সমাজের এমন কিছু সংখ্যক শিক্ষিত ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের অবস্থান, যাঁরা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের প্রচলিত চিন্তাধারার বিপরীতে নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন। এক পর্যায়ে এসে এসব বিচ্ছিন্ন স্বল্প পরিচিত, প্রতিভাবানাদের মতবাদগুলো আগামী দিনের শিক্ষিত সমাজের জন্যে একটা মননশীল চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটায়। এবং সেইসব চিন্তাধারা পরবর্তী যুগের মানুষদের বিশ্বাস ও চিন্তধারার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

এভাবেই আমরা দেখছি যে, আমাদের কল্পিত কোণ-এর শীর্ষদেশে এমন সব প্রতিভাধর ব্যক্তিবর্গ অবস্থান করেন যাঁরা তাঁদের সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের বিরোধী হন এবং তাঁদের বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করেন। এখানেই শুরু হয় মূল বিরোধ। প্রতিভাবানরা সংখ্যার দিক দিয়ে যেমন নগন্য তেমনি স্বল্প পরিচিত। ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হতে থাকে তাঁদের চিন্তাধারা ও আদর্শ। ক্রমে কালের প্রয়োজনে তাঁরা নিজেরাই একটা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এমনকি তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক অবস্থান দখল করে ফেলেন।

আজকের ইউরোপে এখনও যাজকরা রয়েছেন। এখনও সমাজে তাঁদের কর্তৃত্ব রয়েছে। কিন্তু এ যুগের মানস-প্রবণতা শিক্ষিতদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; যাঁরা বিজ্ঞানের দাস, খোদার নয়। তবে, আমরা যদি, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক যুগকে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখবো যে, এ যুগেও সাধারণ মানুষদের চিন্তা ও চেতনা মূলতঃ ধর্মবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এমনকি ধর্ম সংস্কৃতির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও দেখা যাবে যে, আজও □ধর্ম□ সাধারণ মানুষের চিন্তা, চেতনার মূল ভিত্তি হয়ে টিকে আছে।

আজ আমরা দেখছি যে, এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা বিজ্ঞানের পূজারী। আজকের বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত শ্রেণী বিজ্ঞানের পূজা করেন ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাসকে পাওয়ার জন্যে নয়। সুতরাং এ নিয়ম অনুযায়ী আধুনিক কালে শিক্ষিতদের অবশ্যই ধার্মিক হওয়া যাবে না। কেন? কারণ, এ নতুন যুগে সাধারণ মানুষেরাই কেবল ধর্মে বিশ্বাস করেন। কিন্তু এর বিপরিতে দেখা যাবে যে, মধ্যযুগের বুদ্ধিজীবীরা একই সঙ্গে বুদ্ধিজীবী ও ধার্মিক ছিলেন। এ যুগের নব্যশিক্ষিতদের সবাই বিজ্ঞানের পূজারী এবং বিজ্ঞানের পূজা করাই এদের আদর্শে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞানের পূজারী নব্যশিক্ষিতরা ধর্মীয় নির্দেশে ও বিশ্বাসের বিপরীতে মতবাদ হিসেবে এসব আদর্শকে প্রচার করেন। তাঁদের মতবাদ বিজ্ঞানের পূজা করা। এর বিপরীতে ধর্মের আদর্শ হচ্ছে ধর্মীয় নির্দেশে, বিশ্বাসে ও রীতিনীতে; যা প্রশ্নাতীতভাবেই মেনে নিতে হবে।

একটা বিষয় এখানে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মধ্যযুগের মতো আজও □ধর্ম□ সাধারণ মানুষের মাঝেই বিরাজমান। অন্যদিকে, বিজ্ঞান-মনস্ক নব্যশিক্ষিতদের উদ্ভব হয়েছিল সতের শতকে। আজ পর্যন্ত ও দীর্ঘ সময়ে, এসব শিক্ষিত জনগণ বিজ্ঞান পূজার দিকে যতই ঘনিষ্ট হয়েছে- ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা হতে তাঁরা ততই দূরত্বে চলে যাচ্ছে। আর ঠিক একই হারে সাধারণ জনগণ হতেও তারা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে।

মধ্যযুগের শিক্ষিত শ্রেণী ও সাধারণ জনগণের মধ্যে চিন্তা ও বিশ্বাসের সাদৃশ্য ছিলো। তাঁরা একই লক্ষ্যে একইভাবে কথা বলতো। কিন্তু, আজকের শিক্ষিত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে চিন্তা ও বিশ্বাসে বৈসাদৃশ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষিতরা বিজ্ঞানে পূজারী আর সাধারণ মানুষ ধর্মপ্রাণ।

এটা একটা চরম বাস্তবতা যা আমাদের সমগ্র চিন্তা, বিশ্বাস ও হাজারও মন্তব্য দিয়ে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয় যে, কেন বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এতো ব্যাপক হয়েছিলো। একটা দীর্ঘ সময়ব্যাপী ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইরান এবং বিস্তৃত এশিয়ার মানুষদের মধ্যে বিজ্ঞান-মনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশঃই প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে। এমনিভাবে, সতের, আঠারো ও উনিশ শতকব্যাপী বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এতই ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, মানুষের ধর্মবোধ ক্রমশঃই আমাদের □কল্পিত কোণ□র শীর্ষস্থান থেকে ভূমিতে অবতরণ করেছে। এভাবেই বিজ্ঞান ধর্ম এবং ধর্মবোধকে ধ্বংস করে দিতে থাকে। সেই ধ্বংসের পাদপীঠে বিজ্ঞান-ভাবনা এবং বিজ্ঞানের মহিমা স্থান জুড়ে বসে।

আজকের সাধারণ মানুষ মধ্যযুগের সাধারণ মানুষদের মতোই ধর্মে বিশ্বাস করে। বিশ্বব্যাপী তাঁরা ধর্মেরই অনুসারী। সাবেক ধর্ম-বিশ্বাস এখনও তাঁদের মধ্যে বিরাজমান। আজকের নব্যশিক্ষিতরা ঐতিহ্যগত ও জাতীয় ধর্ম হতে বিচ্যুৎ হচ্ছে। ধর্ম-বিশ্বাসই ছিলো তাদের পূর্ব ঐতিহ্য যা হতে তারা আজ দূরে সরে গেছে। আজকে যারা ইউরোপ, আমেরিকা, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের ধর্ম-সংস্কৃতির সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় নিয়োজিত আছেন তারা সবাই এই একই সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন।

এর পরেও একটা সমস্যা থেকে যায়। বর্ণিত দুটো শ্রেণীর বাইরে অন্য একটা দলকে আমরা খুঁজে বের করতে পারি। আমরা দেখেছি প্রত্যেক যুগেই কতিপয় বিরল প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব থাকেন যাঁদেরকে □কোণ□-এর শীর্ষ বিন্দুতে স্থান দিতে আমরা বাধ্য। প্রত্যেক যুগের শেষ পর্যায়ে এসে এসব বিরল প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ সংখ্যার দিক থেকে বড়ো হতে থাকেন। ক্রমেই তারা ক্ষমতা ও শক্তিলাভে সমর্থ হন। তাঁরা আগামী দিনের বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা ও চেতনার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কেপলার আইজাক নিউটন, ফ্রান্সিস বেকন, ও রজার বেকন প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ তাঁদের নিজেদের যুগের মানব সমাজের জন্য ভবিষ্যত চিন্তা-চেতনার সুদূর ভিত্তি রচনা করেছিলেন।

আমার বর্ণিত বিশ্লেষণ অনুযায়ী বর্তমানে কল্পিত □কোণ□ এর শীর্ষে অবস্থানরত ব্যক্তিবর্গ আগামী দিনের বিদ্যাবিদদের চিন্তা চেতনার নির্মাতা হয়ে থাকেন।

এভাবেই আমরা আগামী দিনের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারি। তা কিভাবে? যদি আমরা বর্তমানে □কোণ□ এর শীর্ষে অবস্থানরতদের চিনতে পারি, তাদের চিন্তার পদ্ধতি সম্পর্কে আপনাদের বলতে পারি এবং দেখাতে পারি বিগত তিন শতক ধরে চলে আসা বিজ্ঞান পূজাকে তারা কিভাবে বিরোধিতা করেছেন তাহলেই আমরা সমাধানে

পৌঁছে যাবো। এমনকি, আমরা এ যুগের শেষ পর্যায়ের চিন্তাবিদদের ভাব-প্রবণতা কিভাবে আগামী দিনের চিন্তাবিদদের বিশ্বাস, অনুভূতি ও ভাবপ্রবণতাকে প্রভাবিত করবে তা-ও নিশ্চিত ভাবে জানতে পারবো।

আধুনিক কালেও মানব জাতির মধ্যে কতিপয় বিরল প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের অবস্থান আমরা লক্ষ্য করে থাকি। শিক্ষিতদের মধ্যে এঁদের শীর্ষে স্থান দিতে আমরা বাধ্য। কারণ, একদিকে শিক্ষিত মহল তাঁদেরকে অশিক্ষিত বলে মনে করেন অপরদিকে তাঁরা শিক্ষিতদের চেয়ে ভিন্ন চিন্তা করেন ও ভিন্ন কথা বলেন। এঁদেরই একজন হলেন গুইনন (Guenon)। সম্প্রতি তাঁর রচিত গ্রন্থ □ক্রাইসিস অব দি মডার্ন ওয়ার্ল্ড ও ধর্মীয় গবেষণা-পত্র ইউরোপে প্রকাশিত হয়েছে। এ বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব হঠাৎ করেই একদিন আধুনিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান পূজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলেন। তিনি প্রাচ্যে চলে গেলেন। সেখান থেকে চলে যান মিশরে। কোন শাব্দিক অর্থে নয় বরং সত্যিকার অর্থেই তিনি বর্তমান ইউরোপীয় সমাজ ও চিন্তাধারা হতে সরে দাঁড়ালেন, যাতে করে, তিনি ইউরোপীয় জনগণের প্রয়োজনে ও জ্ঞানপিপাসা নিবারণে সাহায্য করতে পারেন।

তেমনি ইদানিংকালের অপর একজন প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন এলেক্স ক্যারোল। তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ Li homme c□est inconnu সহ বেশ কিছু লেখা ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর লেখা □The Fate of Mankind□ এর দু□টো ফারসী সংস্করণ বের হয়েছে। অনুবাদ সুন্দর না হলেও বিষয়বস্তুর দিক থেকে বইটি সুখপাঠ্য। এ ছাড়াও আইনস্টাইন, উইলিয়াম জেমস, বাসালার্ড প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ। এমনকি সাম্প্রতিককালের জাঁ পল সাঁত্রে ও বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো ব্যক্তিবর্গ যাঁদেরকে বিশ্ববাসী ভালোভাবেই জানেন তার চেয়েও অনেক শ্রেষ্ঠতর হচ্ছেন ফরাসী বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ। আরও আছেন ম্যাক্স প্লাংক, জর্জ গারভিচ, প্যাট্রিক ডোনিজ ও ডাঃ জিভাগোর লেখক প্যাস্টারনাক। নব্যশিক্ষিতদের কাতারে এসব মহান ব্যক্তিত্বদের টেনে আনা যাবে না। এঁদের অবস্থান হচ্ছে শীর্ষে। কারণ বিজ্ঞান পূজাকে এঁরা সাধারণতঃ বিরোধিতা করেন। বিগত তিন শতাব্দী ধরে তথাকথিত শিক্ষিতদের পালিত বিজ্ঞান-ধর্মের বিরুদ্ধে এসব শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কথা বলে এসেছেন।

অবশ্য এ কথাও বলা যাবে না যে, ম্যাক্স প্লাংক ও ক্যারল দু□জনেই হুবহু একই কথা বলেছেন। প্রত্যেকেরই নিজস্ব ও ভিন্ন ভিন্ন মতামত আছে। তা সত্বেও কিছু ব্যাপারে তাঁদের মিলও রয়েছে। আর সেই মিলটাই হবে আমাদের বিবেচ্য বিষয়।

আমরা যদি তাঁদের সেসব অভিন্ন চিন্তাগুলোকে চিহ্নিত করতে পারি তাহলে দেখবো যে, আজ তাঁদের মধ্যে যে সব সাধারণ প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা মূলতঃ আজকের বুদ্ধিজীবীদের মৌলিক ঝোঁক-প্রবণতায় পরিণতি লাভ করেছে। এবং সেই ঝোঁক-প্রবণতার মূলে রয়েছে বিজ্ঞান পূজার সম্পূর্ণ বিরোধী হয়ে ওঠা। মূলতঃ এ প্রবণতাটাই হচ্ছ আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের ধর্ম।

আগামী দিনগুলোতে এ প্রবণতাই অনাগত পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের ধর্মে পরিণত হবে। এবং আধুনিক কালের বুদ্ধিজীবীদের এই ঝোঁক-প্রবণতা ক্রমে বিজ্ঞান পূজার স্থলাভিষিক্ত হবে। এ সকল ব্যক্তিত্বদের মধ্যে একটা সাধারণ ধারণা ব্যতিক্রমহীনভাবে বিদ্যমান, তা হলো আধ্যাত্মিকতার মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাসকে লালন করা। (দুর্ভাগ্যবশতঃ সময়ের সংক্ষিপ্ততার জন্য তাঁদের প্রত্যেকের উদ্ধৃতি দেয়া গেল না)।

আমরা জানি, ধর্মের প্রতি আইনস্টাইনের একটা গভীর অনুরাগ ছিলো। কিন্তু, আমরা বলেছি, ধর্ম হচ্ছে সাধারণ জনগণের বিশ্বাসের বুনিয়াদ। তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে, আইনস্টাইন সাধারণ মানুষের একজন ছিলেন! অথবা তিনি হাইস্কুল পড়ুয়া, কলেজের ডিগ্রীধারী বা আমার মতো একজন পি, এইচ, ডি ওয়ালা নব্য শিক্ষিতদের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন! কখনো না। মূলতঃ তিনি ছিলেন ধার্মিক।

এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞান-পূজা ছাড়াও দুনিয়াতে চিন্তার রাজ্যে একটা নতুন ও মহৎ চিন্তা তরঙ্গের প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা কখনো বলবো না যে, আইনস্টাইনও কেবল সাধারণ মানুষের মতো একই ধরণের ধর্ম-বিশ্বাস পোষণ করেন। বরং আমরা বলতে পারি যে, □ধর্ম□ বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের চেয়েও উর্ধ্বে।

মূলতঃ ধর্মের দু□ধরণের অস্তিত্ব বিদ্যমান। একটা ধর্ম □কল্পিত কোণ□-এর ভূমিতে অবস্থানরত জ্ঞান-বিজ্ঞানহীন সাধারণ জনগণের দ্বারা আচরিত ধর্ম। আমরা ধর্মের উ□চু স্তরের দিকে এগুলো আমাদের যুগে □বৈজ্ঞানিক আস্তিক□ স্তরে উপনীত হবো। এবং এরপর আরোও উপরে meta religion এর অবস্থান। আজকের দুনিয়েতেও এমনটাই পরিলক্ষিত হচ্ছে।

শিক্ষিতদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। কেউ কেউ একই সঙ্গে শিক্ষিত ও ধার্মিক। কিন্তু তাঁর সেই ধর্মবোধ অত্যন্ত নীচু স্তরের। কারণ, ধর্মকে সেই ব্যক্তি তাঁর প্রয়োজনের অতীত একটা বাড়তি সংযোজন বলে মনে করে। ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার যা-ই হোক না কেনো

ধর্মকে সে ধরে রেখেছে অত্যন্ত নাজুকভাবে। তাঁর এই ধর্মবোধ সাধারণ জনগণ হতে নেয়া, যা সে গ্রহণ করেছে ও আঁকড়ে ধরেছে। এমনি ধর্মবোধ একেবারেই অস্বাভাবিক ও অবশ্যই পরিত্যাজ্য। আমার ধারণা, সে যদি ধর্মহীন হয়ে যায় তবে সে বিজ্ঞান বহির্ভূত হবে এবং meta science ধর্মের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে।

অন্য একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে যদি দেখা যায় যে, তিনিও ধার্মিক; আমরা দেখবো বিজ্ঞানের উর্ধ্বে অবস্থিত একটা ধর্মকে তিনি কিভাবে অনুসরণ করেন। তাঁর সেই ধর্মবোধ সহজেই তাঁর লেখনীতে প্রতিফলিত হবে। এই ধরণের ধর্মবোধ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

যে-ধর্ম বিজ্ঞানের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ তা শিক্ষিতদের চেয়েও নিম্ন স্তরের। কিন্তু যে ধর্ম বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে, বিজ্ঞার যার উচ্চতায় এখনও পৌঁছতে পারেনি তা হচ্ছে এ যুগের চিন্তানায়কদের ধর্ম। তাঁরা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তা-চেতনার অনেক উর্ধ্বে অবস্থান করছেন। এঁরা হলেন বর্তমান যুগের প্রতিভা।

মাক্স প্লাংক, আইনস্টাইন বা ক্যারোলের কোন বই বা তাঁদের কোন অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে সহসাই আমরা এমন সব কথা বা উদ্ধৃতি লক্ষ্য করি যে-সব কথাগুলো কোরানে উল্লিখিত বাণীর সাথে মিলে যায়। অর্থাৎ তাঁদের কোন কোন কথা কোরানে উল্লিখিত বাণীর সাথে সামঞ্জস্যের ইঙ্গিত বহন করে। আমাদের বর্ণিত এসব ব্যক্তিত্বের অনেকেই বহুযুগের বহু সংকট অতিক্রম করেছিলেন। একটা যুগ গেছে চরম নাস্তিকতার যুগ। তারপর যুগের প্রয়োজনেই এসেছে সংস্কারের যুগ। এবং সবশেষে এসেছে ধর্মবোধের যুগ যে-ধর্ম বিজ্ঞানের চেয়েও উ□চু এবং শ্রেষ্ঠ।

সেসব সুবিদিত ও সুশিক্ষিত মানুষেরা যাঁরা প্রতিটি যুগের সংকটকে অতিক্রম করে বিজ্ঞান পূজার বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের সবাই আজ আমাদের অতি পরিচিত হয়েছেন। তাঁদের সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা, ধর্মীয় অনুভূতি ও পরিবেশের দিকে ফিরে যাওয়া। ধর্ম যেহেতু সাধারণ জনগণের চিন্তা ও বিশ্বাসের বুনিয়াদ সেহেতু তা অপাংক্তেয় এই যুক্তিতে গত তিন শতক ধরে এসব চিন্তাবিদদের অবজ্ঞা ও নিন্দা করা হয়েছে। আজ তাঁরা মোটেই অবজ্ঞার পাত্র নন, অপাংক্তেয়ও নন।

আজ আমাদের নবতর উপলব্ধির সময় এসেছে। এতদিনে ষোল শতকের সেসব বিজ্ঞান-মনস্ক, প্রতিভাধর ব্যক্তিবর্গ ও আজকের শিক্ষিত শ্রেণীর চিন্তা-চেতনার মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেছে। যদিও এখন পর্যন্ত তাঁদের বক্তব্যগুলো কোন প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়নি। এখনও তাঁদের চিন্তাগুলো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গৃহীত ও পরিস্রুত হয়নি। কিন্তু তাঁদের কথাগুলো বা চিন্তার পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধী-সীমার ঊর্ধ্বে স্থান পাবার যোগ্য। এ সব ব্যক্তিবর্গের বাণী বা বক্তব্যগুলো আগামী দিনের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিশ্বাস ও চৈতন্যের বুনিয়াদ তৈরী করবে।

> সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, আজকের □ধর্ম□ হবে সেই ধর্মের কাছে ফিরে যাওয়া যে-ধর্ম ক্রমেই বিজ্ঞানকে অতিক্রম করছে এবং বিজ্ঞানের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হয়েছে। আজকের যে-বিজ্ঞান পূজা যা সতের শতক থেকে অদ্যাবধি ধর্মবিমুখ ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। সেই বিজ্ঞান পূজা তার অন্তিম পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে কেন? কারণ, আজকের বিশ্বে নবতর চিন্তা-নায়কের আবির্ভাব ঘটেছে। যাঁদের চিন্তা ও চেতনা আধুনিক বিজ্ঞান ভাবনার ঊর্ধ্বে। যাঁদের বৃহৎ চিন্তা, বিশ্বাস, মেধা-মনন দৃঢ়ভাবে মানব জাতির নবতর উপলব্ধির ঘোষণা দিয়েছে। আর তা হলো, সমগ্র বিশ্ব মানবের কল্যাণে বিজ্ঞান-পূজার বিপরীতে ধর্মীয় বিশ্বাসকে উজ্জীবিত করে তোলা।

মাক্স প্লাংক ও কেপলার দু□জনেই ছিলেন পদার্থবিদ। কেপলার সম্বন্ধে প্লাংক বলেছেন, □পণ্ডিত কেপলার জ্ঞানের সামগ্রিকতায় বিশ্বাস করতেন। সৃষ্টির তাবৎ বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্যে গভীর মনোযোগ, সতর্কতা ও সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।□ অপর একজন পণ্ডিত ব্যক্তির উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন- □তাঁকে আমরা একজন ক্ষুদে শিক্ষাণবীশ পণ্ডিত হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। কারণ, বিশ্বের বহুমুখী চিন্তার সামগ্রিকতায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁকে ক্ষুদে পণ্ডিত বলা হচ্ছে এই অর্থে যে, তিনি জ্ঞানের সার্বজনীনতায় বিশ্বাস করতেন না। কেপলার জ্ঞানের সার্বজনীনতায় বিশ্বাস করতেন। আর এ জন্যেই তিনি আধুনিক পদার্থ বিদ্যার স্রষ্টা হতে পেরেছেন।□

এক্ষেত্রে, আইনস্টাইন আরোও স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেছেন, □ধর্মীয় অনুভূতি ও সৃষ্টির গূঢ় রহস্যের উপর বিশ্বাসই হলো যে কোন বৃহৎ গবেষণার চাবিকাঠি□। এই কথাগুলোর জন্য জনগণের গোত্রেও তাঁকে ফেলা যায় না। তবে, আলেক্স কেরল অবশ্যই

প্রথম মানব যিনি দুবার নোবেল শান্তি-পুরস্কার লাভে সমর্থ হয়েছেন। লারইউজ ডিকশ্‌নারীতে তাঁকে একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত-গ্রন্থে তাঁকে বিংশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি আরোও বলেছেন- যদি সমাজ থেকে স্রষ্টার প্রতি ভক্তের আনুগত্য ও প্রার্থনার নিয়ম তুলে দেয়া হয় তবে তা হবে আমাদের সমাজের জন্যে মৃত্যুর সনদপত্রে স্বাক্ষর করার মতো ভয়ঙ্কর।

সতের, আঠারো ও ঊনিশ শতকের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা কি কখনও এমন কথা বলতেন? সতের, আঠারো ও ঊনিশ শতকের শিক্ষিত শ্রেণীর বক্তব্য ছিলো- যদি আমি আমার অস্ত্রোপচারের ছুরির নাগালের মধ্যে খোদাকে দেখতে না পাই তবে আমি তাঁর উপর বিশ্বাস আনতে পারি না। বিজ্ঞান পূজারীদের ভাবনাই মূলতঃ নাস্তিকতা। কিন্তু, আজ নতুন চিন্তা ও চিন্তা-নায়কদের আবির্ভাব ঘটেছে। যা অপর একজন মনোবিজ্ঞানী বলেছেন অন্যভাবে। তিনি বলেন-জীবন ধারণের জন্যে মানুষের যেমন অক্সিজেন ও খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি খোদার আনুগত্য ও তাঁর নিকট প্রার্থনার প্রয়োজনও অপরিহার্য; কেননা এটাই মানব জাতির নিয়তি। এগুলো মানুষের অকৃত্রিম প্রয়োজন। আমরা যদি এই আনুগত্যের প্রয়োজনকে অস্বীকার করি তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।

এবার কেরলের কথায় আসা যাক। তিনি মোটেই ধার্মিক ছিলেন না। চড়ুই পাখীর হৃৎপিন্ড ও হৃৎপিন্ড সংযোজন প্রক্রিয়ার উপর তিনি গবেষণা করেন। আর এ জন্যেই তিনি দুবার নোবেল শান্তি-পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি বলেন- শ্বাস-প্রশ্বাস ও খাদ্য গ্রহণের মতোই আমাদের প্রয়োজন রয়েছে খোদার আনুগত্য করার। এমনকি আমাদের দৈহিক, মানসিক, স্নায়বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজনেও তার আনুগত্য করা আবশ্যক। তিনি আরোও বলেছেন- ধর্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থার অভাবেই রোম সভ্যতার পতন হয়েছিলো।

কথাগুলো আলেক্স কেরলের। তিনি ধার্মিক নন, যাজকও নন। আমাদের কল্পিত কাঠামোর ভূমি সংলগ্ন সাধারণ ধার্মিক, আস্তিকতায় বিশ্বাস করেন। গার্ভিচের বক্তব্য হলো, সুদীর্ঘ ঊনিশ শতক-ব্যাপী সমাজবিজ্ঞান ১৯৮ ধরণের সূত্র আবিষ্কার করেছে এবং যে-গুলোতে মানুষ বিশ্বাস স্থাপন এনেছে; কিন্তু বিংশ শতকের সমাজ বিজ্ঞান সেসবের কোনটাতেই আজ আর বিশ্বাস আনতে পারছে না।

প্রখ্যাত ফরাসী গণিতবিদ সোয়ার্জ বলেন, ঊনিশ শতকের পদার্থ বিজ্ঞানের ধারণা ছিলো প্রতিটি জীবন-সত্য আবিষ্কারে তারা সক্ষম হবেন। এমনকি কবিতায়ও। কিন্তু বিংশ শতকের পদার্থবিজ্ঞান বিশ্বাস করে যে, বস্তু কি তারা তা-ই জানেন না।

কেন বিংশ শতকের বিজ্ঞান-ভাবনা হঠাৎ করেই এমন বিনয়ী মূর্তি ধারণ করেছে? কেনই বা ষোল, সতের, আঠারো ও ঊনিশ শতক-ব্যাপী বিরাজমান বিজ্ঞানের দাম্ভিক আস্ফালন বিচূর্ণ হয়ে গেল? কারণ, ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী একটা নতুন যুগের সূচনা হয়ে গেছে। আগামী দিনের শিক্ষিতদের চিন্তা-ভাবনা হবে বর্তমান কালের শিক্ষিতদের বিপরীত। তাঁদের চিন্তাধারা হবে ধর্ম কেন্দ্রিক। তা হবে এমন একটা ধর্ম যা অবশ্যই বিজ্ঞানের চেয়ে নীচু নয় বরং বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক উচু ও শ্রেষ্ঠ।

সূত্রঃ আগামী প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত আগামী দিনের ইতিহাস" গ্রন্থ

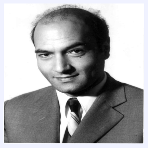

আলী শরীয়তি

দার্শনিক ও চিন্তাবিদ। ইরান বিপ্লবের তাত্ত্বিক রূপকার।